অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড বক্তৃতা ২০২১

বাংলাদেশের রাজনীতির পঞ্চাশ বছর: প্রত্যাশা, প্রকৃতি ও প্রবণতা

আলী রীয়াজ
ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর
রাজনীতি ও সরকার বিভাগ
ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা
শনিবার, ১৩ নভেম্বর ২০২১

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

Professor Dr. Muhammad Dilawar Husain Trust Fund

(Objectives: History, history of Muslims, culture, heritage, human values, protection of human rights, politics of Bangladesh and other various important issues)

Established on 4 November 2015

TRUST MANAGEMENT COMMITTEE (2020 & 2021)

Chairperson	**:** Professor Asha Islam Nayeem
Convener	**:** Professor Md. Abdul Karim
Member	**:** Professor Arifa Sultana
Founder	**:** Professor Muhammad Dilawar Husain
Nominee of the Trust Fund	**:** Mr. Mahmudur Rahman

Published by
Prof. Md. Abdul Karim
Convener
Trust Management Committee
and
Secretary
Asiatic Society of Bangladesh
5, Old Secretariat Road, Nimtali
Ramna, Dhaka-1000, Phone: 223356391

বাংলাদেশের রাজনীতির পঞ্চাশ বছরঃ প্রত্যাশা, প্রকৃতি ও প্রবণতা

আলী রীয়াজ*

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে; হিসাব করার চেষ্টা হচ্ছে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ কতটা অগ্রসর হয়েছে। সঙ্গত কারণেই রাজনীতির প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই আলোচিত হচ্ছে। রাজনীতির আলোচনার কারণ কেবল সুবর্ণ জয়ন্তী নয়, এর আরেকটি কারণ হচ্ছে বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থা। ক্ষমতাসীনদের দাবি যে, দেশে গণতন্ত্র আছে, মানবাধিকার আছে এবং আছে বাক-ব্যক্তির স্বাধীনতা। অন্যদিকে যারা বৈশ্বিকভাবে গণতন্ত্রের পরিমাপ করেন তাঁরা বলছেন যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র সংকটাপন্ন, বাক-স্বাধীনতা সীমিত হয়ে আসছে, নাগরিকের অধিকার সংকুচিত হয়েছে, বিরোধী মতের মানুষের কণ্ঠস্বর ক্ষীয়মান হচ্ছে। বাংলাদেশ নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাঁরা বলছেন যে, গণতন্ত্র এখন নির্বাসিত হয়েছে।

সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসে গত পঞ্চাশ বছরের রাজনীতির ইতিহাসকে কীভাবে দেখা হবে, কী মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা হবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন। আমরা সকলেই জানি যে, কোনো রাষ্ট্রেরই পঞ্চাশ বছরের রাজনীতি সরলরৈখিকভাবে চলেনা, তা বাঁক নেয়, ঘটে মোড় ফেরানো ঘটনা, কখনো কখনো পথ হারিয়ে ফেলে; তার ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় থাকে সাফল্য ও অর্জন – একইভাবে থাকে এমন অধ্যায় যা পুনর্বিবেচনা দাবি করে। বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের রাজনীতির ইতিহাস ঘটনাবহুল। এ কথা বললে কমই বলা হয় যে, এই সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতি ছিল অস্থিতিশীল। এই সময়ে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের বদল ঘটেছে – বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করেছে বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থা, একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা, সামরিক শাসন, বেসামরিক শাসনের ছদ্মবেশে সেনা শাসন, বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা এবং বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থা। এর বাইরে একাধিকবার তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার অধীনে দেশ শাসিত হয়েছে, সেই ব্যবস্থা বাতিলও করা হয়েছে।

রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণের তিন ধারা

যে কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার সবচেয়ে প্রচলিত ধারা হচ্ছে কালানুক্রমিক আলোচনা, তা প্রায়শই দশক বা যুগ ধরে ভাগ করা হয়। কিংবা

* ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র

ক্ষমতাসীনদের সময়কাল ধরে বিভক্ত করা হয়। বাংলাদেশে রাজনীতির ৫০ বছর বিষয়ে আলোচনায় এই ধারাই প্রাধান্য পেয়ে আসছে। সেই হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস ভাগ করা হয় – ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫, ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০, ১৯৯০ থেকে ২০০৬, ২০০৭-২০০৮, এবং ২০০৯ থেকে এখন পর্যন্ত।

এই ধারার গুরুত্বকে খাটো না করেই বলা যায় এতে করে দীর্ঘ-মেয়াদে রাজনীতির বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতা বোঝার সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। ঘটনা এবং ঘটনার ক্রীড়নকরা যতটা গুরুত্ব পান জনগণ - যাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা এবং সক্রিয়তা হচ্ছে ইতিহাসের চালিকা শক্তি – তাঁরা থাকেন ইতিহাসের বাইরে, ফুটনোটে। একথা বলার অর্থ এই নয় যে, পাঠ্যক্রমে কালানুক্রমিক ইতিহাস থাকবে না; কিন্ত রাজনীতির মর্মবাণীকে যারা বুঝতে চান, যারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগুতে চান তাঁদের দায়িত্ব হচ্ছে এই প্রবণতার বাইরে গিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস বিবেচনা করা। বাংলাদেশের রাজনীতির সাফল্য এবং ব্যর্থতাকে ক্রিটিক্যালি দেখা ও আলোচনা করা। কালানুক্রমিক ইতিহাসের পক্ষপাত হচ্ছে ঘটনায়, যে কারণে এর বাইরে গিয়ে উপর্যুপরি ঘটনা ঘটলেও তার বিশ্লেষণ অনুপস্থিত থাকে।

একটি রাষ্ট্রের রাজনীতির ইতিহাস বোঝার আরেকটি পদ্ধতি হতে পারে একটি রাষ্ট্র গঠনের কারণ এবং প্রতিশ্রুতিকে মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা। সালতামামীর বাইরে গিয়ে এই প্রশ্ন বিবেচনা করা কী লক্ষ্য নিয়ে যাত্রার সূচনা হয়েছিল – রাষ্ট্র সেই লক্ষ্য অর্জনে কতটা এগিয়েছে। সবগুলো লক্ষ্য এক দশকে বা পাঁচ দশকে অর্জিত হবে এমন মনে করার কারণ নেই। কিন্তু এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই ইতিহাসকে দেখতে হবে যে লক্ষ্য অর্জনের পথে দেশ এগুচ্ছে কি না। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস বিবেচনার ক্ষেত্রে এই প্রবণতা এখনও প্রধান হয়ে ওঠেনি, যদিও সাম্প্রতিককালে এইভাবে বিবেচনা করার একটি ধারা বিকশিত হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে এটা সহজেই লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকালেই সেই মাপকাঠি উত্তরসূরিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের রজত জয়ন্তীতে এই প্রশ্ন করাই কি যথোপযুক্ত নয় যে, গত ৫০ বছরে রাজনীতি এইসব লক্ষ্য প্রতিষ্ঠায় কতটা অগ্রসর হয়েছে, এই সব লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে ধরণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দরকার ছিল তা গড়ে তোলা গেছে কি না, কেনো এই পথে অগ্রসর হওয়া যায়নি, কীভাবে অগ্রসর হওয়া যাবে? এই প্রশ্নগুলো কেবল যে তোলা যেতে পারে তাই নয়, রাজনীতির কোন ধারাক্রম এগুলোকে কিভাবে প্রতিফলিত করেছে বা করেনি সেটাও দেখা যেতে পারে।

বাংলাদেশের গত ৫০ বছরের রাজনীতিকে বিবেচনা করার আরেকটি পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। তা হচ্ছে এই পঞ্চাশ বছরের সব ধরনের ঘটনা প্রবাহের ভেতরে কী

প্রবণতা স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় তা শনাক্ত করা। ক্ষমতাসীনদের এবং ক্ষমতা কাঠামোর অদল বদল সত্ত্বেও জনগণের আকাঙ্ক্ষা কী, ঘটনা প্রবাহ কী বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তা বিবেচনা করা। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান শক্তি হচ্ছে যে তা ঘটনা প্রবাহকে সামনে আনছেনা বরঞ্চ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সাফল্য এবং ঘাটতি চিহ্নিত করছে, আগামীতে কোন পথে অগ্রসর হওয়া দরকার তার একটি ইঙ্গিতও থাকে।

বাংলাদেশের রাজনীতির তিন বিষয়

বাংলাদেশের রাজনীতি বোঝার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিবেচনায় নিয়ে আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের রাজনীতি গত ৫০ বছর ধরে আবর্তিত হয়েছে তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে – শাসন ব্যবস্থা, উন্নয়ন এবং আত্মপরিচয়। ঘুরে ফিরে কিংবা অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই তিনটি বিষয় উপস্থিত থেকেছে। শাসন ব্যবস্থা বা গভর্নেন্সের প্রশ্নটিকে আমি জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা হিসেবেই বিবেচনা করতে চাই। এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ অভিজাততন্ত্র, এক ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠীর শাসনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গণতান্ত্রিক শাসনই হচ্ছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের লক্ষ্য। বাংলাদেশের রাজনীতির পঞ্চাশ বছরকে বিচার করা দরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষার এই তিন বিষয়কে সামনে রেখেই - বাংলাদেশের রাজনীতি এইসব বিষয়ে কতটা অগ্রসর হয়েছে, এই প্রবণতাগুলো কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে সেটা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

শাসন ব্যবস্থা: গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নৈতিক এবং সাংবিধানিক ভিত্তি রচিত হয়েছিলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে; এই নির্বাচনের ফলকে আওয়ামী লীগের জন্যে একটি ম্যান্ডেট বলেই বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল যে জনগণের ম্যান্ডেটের ভিত্তিতেই এই ঘোষণাপত্র তৈরি হয়েছে। তদুপরি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের যে সংবিধান রচনা করা হয় তাতে যে চারটি আদর্শের কথা বলা হয় তার একটি ছিল গণতন্ত্র।

গণতন্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এবং রাজনীতির একটি বহুল আলোচিত বিষয় হলেও এর কোনো সর্বজনীন সংজ্ঞা তৈরি হয়নি। ফলে আমাদের খানিকটা পেছন থেকেই এই ধারণার উদ্ভব এবং বিকাশের দিকে তাকাতে হবে। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে যে, গণতন্ত্রের কোনো সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই—এ কথার মানে এই নয় যে গণতন্ত্রের মূলনীতি বলে কিছু নেই। গণতন্ত্র কোনো ধরনের বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে আদর্শ বলে বিবেচনা করে না—এ কথার অর্থ এই নয় যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কিছু উপাদান অত্যাবশ্যকীয় নয়। গণতন্ত্র একাদিক্রমে একটি আদর্শ ও একটি শাসনব্যবস্থা। এর দুটি দিককে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই।

গণতন্ত্র বলতে কী বুঝবো?

গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান ও মূলনীতিগুলো অনুসন্ধানের সূচনা হয় প্রাচীন গ্রিসে অ্যারিস্টটলের সময়। তবে ষোড়শ শতাব্দী থেকে রাষ্ট্র ও নাগরিকের অধিকার নিয়ে আলোচনায় এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ব্যারন ডি মন্টেস্কু, টমাস হবস, জন লক, জেরেমি বেনথাম, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল, ডেভিড হিউম ও জাঁ জাক রুশোর অবদান এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের আলোচনাগুলোর শুরু হয়েছে স্বৈরবাদী (অ্যাবসলুটিস্ট) রাষ্ট্রের বিরোধী অবস্থান থেকে, ব্যক্তির স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়ে।

হবসের (১৫৮৮-১৬৭৯) কিছুটা ঝোঁক ছিল স্বৈরতন্ত্রের দিকে, মূলত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই তাঁর এই পক্ষপাত। কিন্তু হবস জনগণের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তির ওপর জোর দিয়েছেন। কিছু অধিকার বিসর্জন দেওয়ার বিনিময়ে 'সার্বভৌম ক্ষমতা' জনগণকে সুরক্ষা দেবে, এমনটাই তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। জন লক (১৬৩২-১৭০৪) সামাজিক চুক্তির প্রশ্নে শুধু যে হবসকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, তা-ই নয়; বরং ধারণাটিকে আরও দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর যুক্তি ছিল, সামাজিক চুক্তিটি হতে হবে অবশ্যই রাষ্ট্র ও শাসিতের মধ্যে। লক খুব স্পষ্টভাবে রাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তাকে খারিজ করেননি। কিন্তু সম্মতির ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সরকার ও তার প্রতিনিধিরা 'শাসিতের কল্যাণ' বজায় রাখতে না পারলে সেই সম্মতি উঠিয়ে নেওয়া যাবে, এ ধারণার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন। যেকোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই সরকার ও শাসিতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি প্রধান পূর্বশর্ত হয়ে উঠেছে। আইনসভা ও নির্বাহী ক্ষমতাকে পৃথক করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

মন্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫) তিন ধরনের সরকারের কথা বলেছেন: প্রজাতন্ত্রী সরকার, যা হয় গণতান্ত্রিক, নয় অভিজাততন্ত্রের রূপ গ্রহণ করতে পারে; রাজতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তিনি জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলেছেন, জনগণই সার্বভৌম। গণতান্ত্রিক সরকার কাঠামোয় ভোটাধিকার ও ভোটদান পরিচালনার আইন অপরিহার্য হয়ে ওঠে এই মূলনীতিগত ধারণা থেকেই।

জাঁ জাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) তাঁর বহুল প্রচারিত *সামাজিক চুক্তি* (১৭৬২) বইয়ে জোর দিয়ে বলেছেন যে মানুষ সামাজিক চুক্তি গ্রহণ করবে। এতে কিছু অধিকার তাদের বিসর্জন দিতে হবে; কিন্তু তা কোনো রাজার কাছে নয়, বরং পুরো সমাজের কাছে, জনগণের কাছে। জনগণ তখন তাদের 'সাধারণ ইচ্ছার' প্রয়োগ ঘটাবে 'জনকল্যাণের' স্বার্থে আইন তৈরি করার জন্যে। রুশোর মতে, সব রাজনৈতিক ক্ষমতাই থাকা উচিত জনগণের হাতে, যা জনগণের সাধারণ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। 'জনগণই নিয়মনীতি তৈরি করবে, যা তারা নিজেরা মেনে চলবে আর তাই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতা।'

এ পর্যন্ত উল্লেখ করা প্রায় সব তাত্ত্বিকই এ কথা বলেছেন যে, এই সাধারণ ইচ্ছা কার্যকর করবে সরকার। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব যে সরকার সীমা লঙ্ঘন করবে না। জেরেমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২) ও জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করেছেন। তাঁদের মতে, শাসিতের কাছে শাসকের জবাবদিহি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেনথাম লিখেছেন, গণতন্ত্রের অংশীদারেরা নিজেদের সুরক্ষার জন্য যে নির্বাহীদের নিযুক্ত করেন, তাঁদের হাতে তাঁরা যেন জুলুম বা লুণ্ঠনের শিকার না হন, সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করে গণতন্ত্র। সেটাই গণতন্ত্রের লক্ষ্য এবং তার প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ স্বৈরাচারী ক্ষমতার হাত থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার দরকার পড়ে। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার দরকার পড়ে এমনকি তাঁদের হাত থেকেও, যাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে 'সাধারণ ইচ্ছার' বাস্তবায়ন করতে। ফলে বেনথাম ও মিল দুজনই জোর দিয়ে যা বলেছেন, তার সারসংক্ষেপ, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডেভিড হেল্ডের ভাষায়, 'ভোট, গোপন ব্যালট, সম্ভাব্য রাজনৈতিক নেতাদের (প্রতিনিধিরা) পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নির্বাচন, ক্ষমতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পৃথককরণ, বক্তৃতা ও জনসংশ্লিষ্টতাই পারে সাধারণত সমাজের স্বার্থ বজায় রাখতে।'

জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩) দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন—গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা। মিলের যুক্তি ছিল, আমাদের জীবনযাপনের জন্য স্বাধীনতা বা লিবার্টি অত্যাবশ্যক। স্বাধীনতা না থাকলে জনগণের কণ্ঠরোধ হবে এবং তারা নতুন চিন্তার অন্বেষণ, আবিষ্কার এবং জনগণ হিসেবে তাদের পরিপূর্ণ বিকাশের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলবে। তাঁর কথা ছিল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাসরত সক্রিয় জনগোষ্ঠীর হাত ধরেই স্বাধীনতার সর্বোত্তম সুরক্ষা সম্ভব। মিল যে তিন ধরনের স্বাধীনতার কথা বলেছেন, তার মধ্যে প্রথমটি হলো চিন্তা ও আবেগের স্বাধীনতা, যার মানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। মিলের বক্তব্য হচ্ছে, শাসনক্ষমতার অতিগুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে অনিবার্য শর্ত হিসেবে একটি সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা থাকা দরকার, যেখানে জনগণের সম্মতির বিষয়টি জনগণের প্রতিনিধিদের ওপর বহাল থাকে। অর্থাৎ ক্ষমতায় যাঁরা থাকবেন, তাঁদের ওপর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সংবিধানের মধ্যেই থাকা দরকার।

বিশিষ্ট রাজনৈতিক তাত্ত্বিকদের কাজের সংক্ষিপ্তসার থেকে দেখা যায়, গণতন্ত্রের চারটি মৌলিক আদর্শ রয়েছে—জনগণের সার্বভৌমত্ব, প্রতিনিধিত্ব, জবাবদিহি ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।

সার্বভৌমত্বের মানে জনগণই সরকার প্রতিষ্ঠা করবে এবং সরকার জনগণের ইচ্ছার অধীন হবে। এ ধারণা স্বৈরাচারী ক্ষমতা বা অভিজাততন্ত্রের শাসনই শুধু অস্বীকার করেনা, বরং তার চেয়ে বেশি আইনের শাসনের দিকেই ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ আইনের চোখে সবাই সমান, এটিই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। সার্বভৌমত্ব একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়। সুতরাং একে

কোনো দৈব ক্ষমতা, উন্নয়ন, জাতীয় নিরাপত্তা অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শের নামে জনগণের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে শাসকের প্রতি শাসিতের সম্মতি প্রদানের উপায়। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে জীবন, স্বাধীনতা ও সুখশান্তির অন্বেষণকে অপরিহার্য অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং 'এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে সরকার গঠন করা হয়েছে, যা তার ন্যায্য ক্ষমতা শাসিতের সম্মতি থেকে আহরণ করবে।' শাসিতের সম্মতিই সরকারকে শাসন করার নৈতিক অধিকারের বৈধতা প্রদান করে। ইংরেজ কবি জন মিল্টনের ভাষায়, 'রাজা ও আধিকারিকদের ক্ষমতা হচ্ছে তা-ই, যা শুধু জনগণের আস্থার ভিত্তিতে, জনগণের সাধারণ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তাদের হস্তান্তর ও প্রদান করা হয়েছে। আর এ ক্ষমতা মূলগতভাবে জনগণের কাছেই থাকে। জনগণের স্বাভাবিক জন্মগত অধিকার লঙ্ঘন না করে তাদের হাত থেকে এ ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া যায় না।'

জবাবদিহি এমন একটি ধারণা, যা একদিকে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের (checks and balances) ওপর ভিত্তি করে বিকাশ লাভ করে; অন্যদিকে সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলিতে নাগরিকদের ভূমিকা নিশ্চিত করে। জাবাবদিহি কেবল খাড়াখাড়ি (উল্লম্ব) পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত হবে না। একটি টেকসই ও কার্যকর গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে জবাবদিহি হচ্ছে উল্লম্ব, আনুভূমিক ও সামাজিক। উল্লম্ব বা খাড়াখাড়ি দায়বদ্ধতা হচ্ছে নির্বাচনব্যবস্থা। আবার সরকারের আনুভূমিক জবাবদিহি তৈরি হয় আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন কিছু ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, যেগুলো কাজ করে জালের মতো। এগুলো হচ্ছে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত কতগুলো সংস্থা, যেমন দুর্নীতিবিরোধী ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো। সামাজিক জবাবদিহি হচ্ছে নাগরিকদের সংগঠনের কাছে জবাবদিহির ব্যবস্থা।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কেন্দ্রে আছে বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, সংঘ গঠন ও সমাবেশের স্বাধীনতা। মানবাধিকারের অন্যতম উপাদান এটি। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি বেনজামিন কারডোজো ১৯৩৭ সালে এক মামলায় একে অধিকারগুলোর মধ্যে 'অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত' বলে বর্ণনা করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী সাংবিধানিক অধিকারগুলোর 'স্তরবিন্যাস' আছে আর সেখানে বাক্‌স্বাধীনতা সব সময়ই সবার ওপরে থাকবে। তাঁর মতে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাই মূল, স্বাধীনতার অন্যান্য প্রায় সব রূপের অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

গণতান্ত্রিক শাসনের তিনটি উপাদান

বিংশ শতাব্দীতে যখন অনেকগুলো দেশ গণতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে এই প্রশ্নটাই প্রধান হয়ে ওঠে যে এই মূল আদর্শগুলো বাস্তবায়িত

হচ্ছে কি না, সেটা কী দেখে বোঝা যাবে। তাঁদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয় গণতন্ত্র কীভাবে চর্চা করা হচ্ছে এবং কীভাবে চর্চা করা উচিত। তাঁদের বিবেচনার কেন্দ্রে থাকে শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের কথা। এই সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর প্রধানতম হচ্ছেন জোসেফ সুম্পিটার, স্যামুয়েল হান্টিংটন, অ্যাডাম প্রেজরস্কি, গিওভান্নি সার্টোরি, হুয়ান লিঞ্জ ও রবার্ট ডাল।

সুম্পিটারের সংজ্ঞা অনুযায়ী গণতন্ত্র হচ্ছে 'রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেখানে জনগণের ভোটের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে কোনো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করে।' হান্টিংটনের মতে, 'গণতন্ত্র হচ্ছে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা নির্বাচিত হয় একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও পর্যায়ক্রমিক নির্বাচনের মাধ্যমে। যেখানে প্রার্থীরা স্বাধীনভাবে ভোটের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং কার্যত সকল প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীই ভোটদানের উপযুক্ত বিবেচিত হয়।' প্রেজরস্কি ও অন্যরা দাবি করেন, 'গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে দলগুলো নির্বাচনে পরাজিত হয়।' সুতরাং এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: ১. পূর্বানুমানের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ২. ফলাফল প্রাপ্তির পর অপরিবর্তনযোগ্যতা ৩. পুনরাবৃত্তি। সহজ ভাষায় বললে, আমরা জানি না যে কে ক্ষমতায় আসবে, নির্বাচনে একবার তা নির্ধারিত হলে সেটি বদলে ফেলা যায় না এবং এই যে চক্র — অনিশ্চয়তা এবং ফলাফল গ্রহণের প্রক্রিয়া, তা চলতেই থাকে।

রবার্ট ডাল-এর মতে, কোনো ব্যবস্থাকে 'গণতান্ত্রিক' হতে হলে তার সাতটি পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে। নির্বাচিত কর্মকর্তা, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, সর্বজনীন ভোটাধিকার, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য প্রার্থী হওয়ার অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্যের বিকল্প উৎস এবং সংগঠন তৈরির স্বাধীনতা। ডাল জোর দিয়ে বলেছেন যে গণতন্ত্রের জন্য 'শুধু অবাধ, সুষ্ঠু ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনই নয়, বরং এগুলোকে সত্যিকারভাবেই অর্থপূর্ণ করে তোলার মতো স্বাধীনতাও প্রয়োজন (যেমন সংগঠন গড়ে তোলার স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা)। তথ্যের বিকল্প উৎস এবং নাগরিকদের ভোট ও পছন্দের ওপর ভিত্তি করে সরকারি নীতিমালা প্রণয়নের নিশ্চয়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজন।'

এই সব গবেষণার ওপর নির্ভর করে গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য তিনটি উপাদানকে অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। সেগুলো হচ্ছে ১. সর্বজনীন ভোটাধিকার; ২. আইনসভা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদের জন্য নিয়মিত অবাধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, বহুদলীয় নির্বাচন ৩. নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, যার মধ্যে মতপ্রকাশ, সমাবেশ ও সংগঠন তৈরির স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত। একই সঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যার অধীনে সব নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা সত্যিকারের আইনি সম-অধিকার ভোগ করবেন। কোনো দেশকে গণতান্ত্রিক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে তার

এই তিনটি মানদণ্ডেই উতরাতে হবে। কারণ, এর যেকোনো একটি অনুপস্থিত হলেই অন্যগুলোর উপস্থিতি প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

গত কয়েক দশকে যেটা সহজেই লক্ষ্য করা গেছে, তা হলো, দেশে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গণতন্ত্রায়ণের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচনের ওপর এতটাই জোর দেওয়া হয়েছে যে অনেক অগণতান্ত্রিক দেশ ১৯৯০-এর দশক থেকে নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে দেখাতে চায় যে তারা গণতন্ত্রের চর্চা করছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন নির্বাচনকে গণতন্ত্র সংহত হওয়া না হওয়ার পরীক্ষা হিসেবেই দেখিয়েছিলেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, একটি দেশে গণতন্ত্র স্থায়ী রূপ নিয়েছে কি না, সেটা বোঝা যাবে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে ওই দেশ পরপর দুটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে পারছে কি না, যাতে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে। তাঁর ভাষায়, এটি হচ্ছে 'টু টার্নওভার টেস্ট' (দুবার হাতবদলের পরীক্ষা)। পরাজিতরা ফলাফল মেনে নিয়েছে কি না এবং বিজয়ীরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানকে পাল্টে দিয়ে কর্তৃত্ববাদী শাসনের সূচনা করেছে কি না, সেটা গণতন্ত্রায়ণের নির্ধারক পরীক্ষা।

সবার জন্য আইনিভাবে ভোটাধিকার নিশ্চিত করা এবং নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান আপাতদৃষ্টে গণতন্ত্রের দুটি আবশ্যকীয় শর্ত পূরণ করলেও নির্বাচন যদি অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক না হয়, তবে সেগুলো আসলে দেশকে গণতন্ত্রের পথে তো অগ্রসর করেই না, বরং উল্টো পথে ঠেলে দেয়। দেখা দরকার যে এই সব নির্বাচন গণতন্ত্রকে সংহত করার বদলে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাকে আরও সংহত করে কি না। নির্বাচনে জালিয়াতির বিভিন্ন ধরনের উপায় এই সব ক্ষমতাসীন বের করেছেন, যেগুলোর কিছু প্রত্যক্ষ আর কিছু হচ্ছে পরোক্ষ। এটাও মনে রাখা দরকার যে নির্বাচন এক দিনের বিষয় নয়, ভোটাররা এক দিন ভোট দেন, কিন্তু নির্বাচনের প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ নেওয়া হয় আরও অনেক আগে থেকেই। সেগুলোর মাধ্যমে আগে থেকেই ফল প্রভাবিত করার ব্যবস্থা করা হলে নির্বাচনের দিন কী হলো, তার কোনো মূল্য থাকে না, ভোটাররা তখন নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী হন না। নাগরিকদের অধিকার—কথা বলার, মতপ্রকাশের, সমাবেশের এবং সর্বোপরি এই সবের কারণে আইনি এবং বিচারবহির্ভূতভাবে লাঞ্ছিত না হওয়ার নিশ্চয়তা হচ্ছে গণতন্ত্রের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়।

এই আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গণতন্ত্রের চারটি মূলনীতি আছে — জনগণের সার্বভৌমত্ব, প্রতিনিধিত্ব, জবাবদিহি ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা; এই চারটি মূলনীতি বাস্তবে আছে কিনা, তার চর্চা হচ্ছে কিনা সেটা বোঝা এবং পরিমাপের উপায় হচ্ছে তিনটি প্রায়োগিক দিকের প্রতি নজর দেয়া - সর্বজনীন ভোটাধিকার; নিয়মিত অবাধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, বহুদলীয় নির্বাচন, এবং মতপ্রকাশ, সমাবেশ ও সংগঠন তৈরির স্বাধীনতাসহ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো এবং আইনের শাসনের নিশ্চয়তা। এই সব বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস গণতন্ত্রের পথে অগ্রযাত্রার কথা বলেনা।

বাংলাদেশ প্রথম দুই দশক কর্তৃত্ববাদী শাসনের – বেসামরিক, সামরিক কিংবা বেসামরিক শাসনের ছদ্মবেশে সামরিক শাসন – আওতায় থেকেছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে যাই বলা হোক না কেন তার বাস্তব কিছু উপস্থিত ছিলনা। সংবিধানে ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।" একদলীয় ব্যবস্থা কিংবা সামরিক শাসনের সময় জনগণের ক্ষমতা প্রয়োগের উপায় ছিলনা, এগুলো জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি নয়। কিন্ত এই দুই যুগের অবসানে ১৯৯১ সালে যে সম্ভাবনার সূচনা হয়েছিল তার পথ পরিক্রমা গণতন্ত্রের অভিমুখী হয়নি।

এই যাত্রার সূচনা হয়েছিল নির্বাচনী গণতন্ত্র দিয়ে। অর্থাৎ নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সেই লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষাকবচ তৈরি না হলেও নিয়মিতভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবং তাতে অবাধে ভোট দেবার অধিকার ছিল, গণমাধ্যমের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ছিল সীমিত, নাগরিকদের সমাবেশের ওপরে নিষেধাজ্ঞা ছিল কম। কিন্ত তা ক্রমাগতভাবে ক্ষয় হতে শুরু করে, ক্ষমতার এক কেন্দ্রীকরণ ঘটে, সংসদীয় ব্যবস্থার আড়ালে প্রধানমন্ত্রীর শাসন বা এক ব্যক্তির শাসনের উদ্ভব ঘটে। এই সব প্রবণতা আধা কর্তৃত্ববাদের দিকেই দেশকে ঠেলে দেয়। গণতন্ত্রের জন্যে অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে না তোলায় ক্ষমতাসীনদের কোনোরকম চেক এ্যান্ড ব্যালেন্সের মোকাবিলা করতে হয়নি। প্রধান দুই রাজনৈতিক দল – আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-এর ভেতরে ক্ষমতা এক কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা এমনভাবে জেঁকে বসে যে কোন দল ক্ষমতায় থাকলো তাতে কোনো পার্থক্য ঘটেনি। আধা-কর্তৃত্ববাদ হচ্ছে এমন এক ধরনের শাসনের সূচনা পর্ব যাকে বলা হয় দোআঁশলা শাসন ব্যবস্থা – হাইব্রিড রেজিম। হাইব্রিড রেজিমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো দেখতে গণতান্ত্রিক কিন্ত মর্মবস্তুর বিবেচনায় এগুলো স্বৈরতান্ত্রিক। এতে গণতন্ত্রের কিছু কিছু দিক, যেমন নিয়মিত নির্বাচন, কিন্ত গণতন্ত্রের অনেক উপাদান অনুপস্থিত থাকে। দুই দলের রাজনৈতিক শক্তি এবং সমর্থনের কারণে শাসন পদ্ধতি রূপান্তরিত হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কর্তৃত্ববাদের। এই ধরনের কর্তৃত্ববাদ হচ্ছে ইলেকটোরাল অথরিটারিয়ানিজম – নির্বাচনের মুখোশের আড়ালে কর্তৃত্ববাদ। এই ব্যবস্থায় অথরিটি অর্জন এবং প্রয়োগের জন্যে আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হয়, এর বাইরে এইসব প্রতিষ্ঠানের কোন মূল্য থাকেনা – বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে সেটাই দেখতে পাই ২০০১ সালের পর। কিন্ত সেই অবস্থাও বেশি দিন টেকেনি, ২০০৯ সালের পরে বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে এমন এক অধ্যায়ে যেখানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ছিল একচেটিয়া আধিপত্যশীল কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠার। সংবিধানের পঞ্চদশ

সংশোধনী, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করেছে একচেটিয়া নির্বাচনী আধিপত্যশীল কর্তৃত্ববাদী শাসন।

এই রূপান্তরের মাধ্যমে কেবল যে নির্বাচনী ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তা নয়, বিরাজনীতিকরণের এমন এক প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে যেখানে ক্ষমতার কেন্দ্রে গুটিকয় রাজনৈতিক এলিট, আমলাতন্ত্র এবং রাষ্ট্রের নিপীড়ক বাহিনীগুলো একটি সম্মিলিত শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে করে রাষ্ট্র, সরকার এবং ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে এখন আর কোনো ধরনের দেয়াল উপস্থিত নেই। একটি গণতান্ত্রিক রিপাবলিকে এগুলোর পার্থক্য থাকা অত্যাবশ্যক। ক্ষমতাসীন দল এবং তার সমর্থকদের বাইরে আর সব নাগরিকের জন্যে রাজনীতি করা এখন রীতিমত অপরাধ বলেই প্রতিষ্ঠিত। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এতটাই সংকুচিত যে এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়ে টেলিফোনে কথা বলতেও মানুষ নিরাপদ বোধ করেন না। নজরদারীর ব্যবস্থা এতটাই জোরদার করা হয়েছে যে দেশে এক ভয়ের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত। ২০১৮ সালে প্রণীত ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নাগরিকের জন্যে এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস) সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের জুলাই পর্যন্ত এই আইনের আওতায় কমপক্ষে এক হাজার ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়েছেন। এই সমীক্ষায় ৫৯৩টি মামলার বিস্তারিত সংগ্রহ করা হয়। তাতে ১২৭৭ জন অভিযুক্ত হয়েছেন, যার মধ্যে ১২৮ জন সাংবাদিক, ৩৩ জন শিক্ষক, ১৭৯ জন রাজনীতিবিদ, ৫২ জন শিক্ষক। অভিযুক্তদের ১১ দশমিক ২৬ শতাংশ হচ্ছেন সাংবাদিক। এই সব মামলায় আটক ৪৩০ জনের মধ্যে ৪১ জন সাংবাদিক।

অথচ বাংলাদেশের মানুষ যে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষী সেই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত গণতন্ত্রের আন্দোলন, ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ সালে পর্যন্ত নির্বাচনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ এবং রাজনীতিতে ব্যাপক সংখ্যক দলের উপস্থিতি তাই প্রমাণ করে। স্মরণ করা যেতে পারে ১৯৯১ সালে ভোট দানের হার ছিল ৫৫ দশমিক ৪৫ শতাংশ; ২০০৮ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৮৫ দশমিক ২৬ শতাংশে। ২০১৭ সালে একটি গবেষণা প্রকল্পের অধীনে ৪ হাজার ৬৭টি পরিবারের মধ্যে চালানো জরিপে যে চারটি বিষয়কে গণতন্ত্রের সূচক হিসেবে উত্তরদাতারা চিহ্নিত করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং মতপ্রকাশ ও সমাবেশের স্বাধীনতা। ২০১০ সালে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত গভর্ন্যান্স ব্যারোমিটার সার্ভে বাংলাদেশ ২০১০ জরিপে দেখা যায়, ৮০ শতাংশ উত্তরদাতাই মনে করেন, গণতন্ত্রের তাৎপর্যপূর্ণ আদর্শই হচ্ছে নির্বাচন। এরপরই আছে অবাধ গণ-বিতর্ক (৭১ শতাংশ), সম্মতির দ্বারা শাসন (৬০ শতাংশ), সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের ক্ষমতা (৫০ শতাংশ) এবং সরকারি কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষমতা (৪০ শতাংশ)। এর আগে ২০০৩ সাল থেকে ২০১৩ সালের বিভিন্ন জরিপেও নাগরিকরা এই কথাগুলোই বারবার বলেছেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান সুস্পষ্ট করেই বলেছেন, "৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো দেশে কার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা তৈরি করা যায়নি। সংসদও অকার্যকর, যেখানে কারো জবাবদিহির ব্যাপার নেই।" ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এই ঐকমত্য তৈরি হয়েছিল যে, সংসদ রাজনীতির কেন্দ্র হবে। দেশের এলিট শ্রেণির মধ্যে এই রাজনৈতিক বন্দোবস্ত হয়েছিল যে ক্ষমতা হস্তান্তরের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি তৈরি করা হবে। নাগরিকদের সঙ্গে কার্যত একটি লিখিত চুক্তিই হয়েছিল।

সকলের অংশগ্রহণে তুলনামূলক সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিয়েছে যে ব্যবস্থা – তত্ত্বাবধায়ক সরকার – তার অবসান ঘটানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের যে ধারা স্বাধীনতার পরেই শুরু হয়েছিল এবং সেনাশাসকেরা অব্যাহত রেখে তাঁদের বিজয় নিশ্চিত করেছেন, সেই ব্যবস্থায়ই দেশ ফিরে গেছে।

প্রতিষ্ঠান গড়ার এই অনাগ্রহের এক বড় প্রমাণ এই যে, সংবিধানে বলা হয়েছে 'আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন'; কিন্তু এই আইন আজও তৈরি করা হয়নি। যে সকল স্বাধীন প্রতিষ্ঠান ক্ষমতাসীনদের জবাবদিহির জন্যে আবশ্যিক – মানবাধিকার কমিশন কিংবা দুর্নীতি দমন কমিশন – সেগুলোকে কার্যকরভাবে গড়ে তোলা হয়নি।

বিপরীত দিকে ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ হয়েছে – প্রধানমন্ত্রীর হাতে সাংবিধানিকভাবেই তুলে দেয়া হয়েছে একচ্ছত্র ক্ষমতা, প্রধানমন্ত্রীর শাসন তৈরি হয়েছে – যে প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী বিভাগের প্রধান। এর পেছনে আছে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী – যা দুই প্রধান দলের সম্মতিতে পাশ হয়েছে, চতুর্দশ সংশোধনী যা পাশ হয়েছে বিরোধী দলের আপত্তিকে উপেক্ষা করে, কিংবা ষোড়শ সংশোধনী – যা পাশ হয়েছে কার্যত একদলীয় সংসদে। নির্বাহী বিভাগের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতা পান তার সঙ্গে যুক্ত হয় সংবিধানের বাইরে তিনি যে ক্ষমতা দলের সূত্রে পান তা, সেখানেও গণতন্ত্রের চর্চা নেই। এটি বিশেষ কোনও দলের বৈশিষ্ট্য নয়, এটিই রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যেই নির্বাচনের তাগিদ অবসিত হয়ে গেছে ২০১১ সালেই; ফলে শাসিতের সম্মতির দরকার নেই, প্রতিনিধিত্ব নেই। শক্তি প্রয়োগই হয়ে উঠেছে শাসনের ভিত্তি। কিন্তু শক্তি প্রয়োগের এই ধারার পথ ও পদ্ধতি ছিল সেনা শাসনের লক্ষণ। জনগণ তা থেকে মুক্তি চেয়েছিল। অথচ আইন করেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছিল ২০০৪ সালে। তার মাত্রা এখন অতীতের সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে কেননা আইনী দায়মুক্তির আর প্রয়োজনই নেই। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা এখন প্রাত্যহিক বিষয়। ক্ষমতা কাঠামোর বলয়ে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি হয়েছে যেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রতিষ্ঠানের ওপরে নির্ভরতা সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য।

নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহির আরেক উপায় হচ্ছে স্বাধীন বিচার বিভাগ। সংবিধানে ১৯৭২ সালে নির্বাহী এবং বিচার বিভাগের মধ্যে দূরত্বের কথা লিপিবদ্ধ করা হলেও ২০০৭ সালের আগে তা এমনকি কাগজে-কলমেও তার উপস্থিতি দেখা যায়নি। তারপরেও অবস্থা বোঝার জন্যে অবসর গ্রহণের আগে বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দারের কথাই যথেষ্ট - 'সাংবিধানিকভাবে বিচার বিভাগ স্বাধীন। কিন্তু বাস্তবে কতটুকু, তা আমরা সকলেই জানি এবং বুঝি।'

উন্নয়ন: কোন পথে এগুচ্ছে দেশ

১৯৭০ সালে 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন" বলে যে পোস্টার পাকিস্তানী অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল তার মর্মবাণী ছিল একটি সুষম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, যেখানে দারিদ্র্য এবং বৈষম্যের অবসান ঘটবে। বাংলাদেশের মানুষের উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষার এটি ছিল মূর্ত রূপ।

গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিপুলভাবে বিকশিত হয়েছে। অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে, স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনায় বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান ছিল ৫৯.৬১ শতাংশ যা ১৯৭৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৬১.৯৫ শতাংশ, ২০২০ সালে কৃষির অবদান হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২.৬৪; শিল্প খাতের অবদান ১৯৭২ সালে ছিল মাত্র ৩.৯৮, ২০২০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১৮.৯৩ শতাংশ। সেবা খাতের অবদান ১৯৭২ সালের ৩৪.৩২ থেকে ২০২০ সালে ৫৪.৬৩ শতাংশ। এই সব কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে সমাজে শ্রেণি বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটেছে। পাশাপাশি প্রচলিত মাপকাঠির হিসেবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটছে। এটাও স্মরণ করা দরকার যে, এই সাফল্যেও কেন্দ্রে থেকেছে তিন শ্রেণির মানুষ – গার্মেন্টস খাতের শ্রমিক, স্বল্প-মেয়াদের অভিবাসী শ্রমিক এবং কৃষক। এই অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রভাবে সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক অগ্রগতিও হয়েছে।

সরকারি হিসাবে করোনা ভাইরাসের অতিমারির আগে পর্যন্ত এক দশকে প্রতি বছর জিডিপিএ প্রবৃদ্ধি হয়েছে গড়ে ৬ শতাংশের বেশি। বিভিন্ন সময়ে সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছিল শ্লথ। ১৯৯১ সালের পর থেকে বড় ধরণের প্রবৃদ্ধির সূচনা হয়। রাষ্ট্র, যখন যে দল ক্ষমতায় থেকেছে তাঁদের প্রচেষ্টা, ব্যক্তি খাতের অবদান, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ করা যায় যে, ২০০২ সালে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৮ শতাংশ যা ২০০৭ সাল নাগাদ গিয়ে দাঁড়ায় ৭.০৫ শতাংশে। আবার ২০০৯ সালে এই হার ছিল ৫.০৪ শতাংশ তা ২০১৯ সালে এসে দাঁড়ায় ৮.১৫-এ। অর্থনীতিবিদ এবং সব সরকারের পক্ষ থেকে গত কয়েক দশক ধরে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি বা জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হিসাবকেই উন্নয়নের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন বিষয়ে

যারা গবেষণা করেন তাঁরা এটা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন যে, জিডিপি বৃদ্ধি এককভাবে কোন দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি নয়, তার জন্যে দেখা দরকার মানব উন্নয়নের অবস্থা কী, দীর্ঘ মেয়াদে পরিবেশের ওপরে তার প্রভাব কী। সর্বোপরি দেখা দরকার যে এই প্রবৃদ্ধি সকলের মধ্যে সুষম ভাবে বণ্টিত হচ্ছে কিনা।

দ্বিতীয়ত, অনেক দেশের ক্ষেত্রেই, বিশেষত যে সব দেশ কর্তৃত্ববাদী শাসন আছে সেখানকার সরকারের দেয়া তথ্য নির্ভরযোগ্য কি না সেই বিষয়ে সংশয় আছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই জিডিপি'র সাফল্য – নির্ভর উন্নয়নের বক্তব্য একাধিক কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের একজন সাবেক সচিব স্বীকার করেছেন যে, 'জিডিপি কত হবে, তা আগে ঠিক করা হয়। পরে 'ব্যাক ক্যালকুলেশন' করে হিসাব ঠিক করা হয়।' সরকারের দাবি যে অনেক সময় অতিরঞ্জিত, সেটাও দেখা গেছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.২৪ শতাংশ, বাজেটে এই প্রাক্কলন করার পরে অর্থনীতিবিদরা এই নিয়ে প্রশ্ন তুললে সরকারের পক্ষ থেকে তা নাকচ করে দেয়া হয়। কিন্ত এক বছর পরে ২০২১ সালে আগস্ট মসে সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, প্রকৃতপক্ষে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.৫১ শতাংশ।

গত ৫০ বছরে দেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়েছে। এই হ্রাসের পরিমাণ বিষয়ে বিতর্ক আছে। তবে সরকারের হিসাবে বলা হচ্ছে যে, ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৫৮ শতাংশ, ২০০০ সালে ৪৪ শতাংশ; ২০০৫ সালে ৪০ শতাংশ; ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান সঠিক কি না সেটা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও এটা সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য যে দারিদ্র্য কমেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তি খাতের প্রসারের সূচনা হয়েছিল একার্থে ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে, তা আরও বিকশিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের পরে যখন বাংলাদেশ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অঙ্গীভূত হয়। এই ধারা দশকের পরে দশক অব্যাহত থেকেছে। তাতে করে গড়ে উঠছে একটি ধণিক শ্রেণি; রাষ্ট্রের পরিপোষণে কেবল তার বৃদ্ধি ঘটেছে তা নয়, এখন তা এমন এক রূপ নিয়েছে যেখানে এই শ্রেণি এখন এক লুটেরা ব্যবস্থার সূচনা করেছে। অধ্যাপক রেহমান সোবহান যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন এইভাবে – 'রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া এলিট শ্রেণি ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করার রীতি চালু করেছে। পুঁজিবাদের অর্থনীতি থেকে এলিট শ্রেণি সুবিধা পেয়েছে। তারা প্রচুর অর্থসম্পদ স্থানান্তর করেছে'। মইনুল ইসলাম লিখেছেন, 'জাতীয় পার্টি, বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের শাসনামলের

তিন সরকার প্রধান - এরশাদ, বেগম জিয়া এবং শেখ হাসিনা এই ক্রোনি ক্যাপিটালিজমকে লালন করে চলেছেন, যার ফলে তাঁদের আত্মীয় স্বজন, ক্ষমতাসীন দল বা জোটের নেতা-কর্মী এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা-প্রাপ্ত ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, সামরিক অফিসার এবং আমলারা পুঁজি লুণ্ঠনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অবিশ্বাস্যগতিতে ধন-সম্পদ আহরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে এদেশে স্বতন্ত্রভাবে ধনসম্পদের মালিক হওয়া প্রায় অসম্ভব বিবেচিত হয়ে থাকে'। এই শ্রেণির লুণ্ঠনের মাত্রা বোঝার জন্যে এই তথ্যই যথেষ্ট যে, বহুজাতিক আর্থিক পরামর্শ দানকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েলথ এক্স-এর হিসেব অনুযায়ী গত দশকে সম্পদশালীর সংখ্যা বৃদ্ধির হারের দিক দিয়ে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। ২০১০ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে দেশে ৫০ লাখ ডলারের বেশি সম্পদের অধিকারীর সংখ্যা বেড়েছে গড়ে ১৪ দশমিক ৩ শতাংশ হারে। আর এই অর্থের এক বড় অংশই যে পাচার হয়ে গেছে সেটাও সকলের জানা। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) তৈরি করা হিসাব অনুযায়ী ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে প্রায় ৭ হাজার ৫৮৫ কোটি ডলার বা ৬ লাখ ৬ হাজার ৮৬৮ কোটি টাকা।

বাংলাদেশে তিন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এই লুটেরা শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে, আনু মুহাম্মদ এদেরকে 'লুম্পেন কোটিপতি' বলে বর্ণনা করেন। তিনি লিখেছেন, 'প্রথম পর্বে ছিল লাইসেন্স, পারমিট, চোরাচালানি, মজুতদারি, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানা, সম্পদ আত্মসাৎ ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্বে এর সঙ্গে যোগ হয় ব্যাংক ঋণ ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকানা লাভ।' তৃতীয় পর্বে, 'পুরো ব্যাংক খেয়ে ফেলা,...এমনকি সর্বজনের সব সম্পদই এখন বাংলাদেশে এই শ্রেণির কামনা-বাসনার লক্ষ্যবস্তু'তে পরিণত হয়েছে।

এই অর্থনৈতিক নীতিমালা দৃশ্যত যে উন্নয়নের আলো ঝলমলে দৃশ্য উপহার দেয় তার পেছনে লুকিয়ে আছে এই চিত্র যে, দেশে আয় বৈষম্য বেড়েছে। আয় বৈষম্য মাপার পদ্ধতি জিনি সহগ। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জিনি সহগ ছিল মাত্র ০.৩৬; ১৯৮৮-৮৯ সালে তা দাঁড়ায় ০.৩৮; ১৯৯৫-৯৬ সালে দাঁড়ায় ০.৪৩; ২০০৫ সালে দাঁড়ায় ০.৪৬; ২০১০ সালে দাঁড়ায় ০.৪৬; আর ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ০.৪৮। এই চিত্রের অর্থ হচ্ছে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে দারিদ্র্য থাকলেও বৈষম্য ছিল কম। বাংলাদেশে সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে তৈরি করেছে বৈষম্য।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে জাতীয় আয়ে দরিদ্র এক-পঞ্চমাংশ মানুষের ভাগ কমেছে। ১৯৯১ সালে দরিদ্র ২০ শতাংশ মানুষের ভাগ ছিল ৬ দশমিক ৫২ শতাংশ, ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫ দশমিক ৭১ শতাংশ, ২০০০ সালে ৬ দশমিক ১৫ শতাংশ, ২০০৫ সালে ৫ দশমিক ২৬ শতাংশ এবং ২০১০ সালে ৫ দশমিক

২২ শতাংশ। অর্থাৎ ১৯৯১ সালের তুলনায় গরিব এক-পঞ্চমাংশ মানুষ এখন আরও দরিদ্র হয়েছে। ২০১০ এবং ২০১৬ সালের খানা জরিপে দেখা যায় যে, সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ জিডিপি অর্জনকারী খানাগুলোর হাতে ছিল মোট জিডিপির ০.৭৮ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা দাঁড়িয়েছে ০.২৩ শতাংশ; অন্য দিকে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ জিডিপি অর্জনকারী খানাগুলোর ভাগ ২৪.৬১ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭.৮৯ শতাংশ। সহজ ভাষায়, বাংলাদেশে ১০০ টাকা আয়ের ২৮ টাকা যাচ্ছে ধনী পাঁচ শতাংশ পরিবারে, আর মাত্র ২৩ পয়সা পাচ্ছে সবচেয়ে গরিব পাঁচ শতাংশ পরিবার। আয়ের এই বৈষম্য ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি করে। ভোগের ক্ষেত্রেও; ২০২০ সালে বৈষম্য বেড়ে হয়েছে জিনি সূচক ০.৩৫, যা ২০১৬ সালে ছিল ০.৩২।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এই বৈষম্য ও লুণ্ঠনের ধারাকেই বলা হচ্ছে উন্নয়ন এবং এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি এবং জবাবদিহির শাসনকে জলাঞ্জলি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে; তার প্রতি সমর্থন দেবার মানুষের অভাব হচ্ছেনা। এটাও স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক সময় বৈষম্য অবসানের কথা বলা হতো, রাজনীতিবিদরা সেই প্রতিশ্রুতি দিতেন। কিন্তু গত কয়েক দশকের ব্যবধানে সে কথা শোনা যায়না। যে উন্নয়নে বৈষম্য বেড়েছে সেই উন্নয়নই হয়ে উঠেছে আরাধ্য।

আত্মপরিচয়ের রাজনীতি

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্নে এক দিকে এটা ছিল অকল্পনীয় যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন একটি প্রধান বিষয়ে পরিণত হবে, অন্যদিকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এই ধারণাই দিচ্ছিলো যে আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন মীমাংসিত হয়ে যায়নি। যে কোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে যা হয় ১৯৬০-এর দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর অন্যথা ঘটেনি। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে একাদিক্রমে বাংলাদেশের অন্য জাতিগোষ্ঠির বিষয়কে আড়াল করে ফেলছে এবং সমাজের ভেতরের শ্রেণি বিভাজনকে গুরুত্ব দিচ্ছেনা এটা সেই সময়েও প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময়ে জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্নে যে বিতর্ক এবং যে বিতর্কের শেষ বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় বাঙালি বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেখানেই আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে বিভাজনের বীজ বোনা হয়ে গিয়েছিল। এটি কেবল যে, এ দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অস্বীকৃতি ছিল তা নয়, এর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সংখ্যাগুরুবাদ বা মেজরিটারিয়ানিজমের লক্ষণ। জাতীয়তা বিষয়ক বিতর্কের আইনী বা সাংবিধানিক সমাপ্তি হয়েছিল ১৯৭২ সালেই; কিন্তু পরে ১৯৭৮ সালে সংবিধানে নাগরিকের পরিচয় বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটি ভিন্নভাবে রাজনীতির কেন্দ্রে এসে হাজির হয়। একই সময়ে সংবিধানের অন্যান্য বদল –

রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে সেক্যুলারিজম/ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বাদ দেয়া এবং ধর্মভিত্তিক দলকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসে। একে কেন্দ্র করে দেশে রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে, হচ্ছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে এক ধরণের সমাধান তৈরি হয়েছে বটে, যেখানে একাদিক্রমে বাঙালি এবং বাংলাদেশি পরিচয়কে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, অন্য দিকে দেশের অপরাপর জাতিগোষ্ঠী এবং আদিবাসীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। এটা বলা দরকার যে, ১৯৭৮ সালের পরে আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন কেবল জাতীয়তার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকেনি। একে রাজনীতি ও ক্ষমতার লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এই বিষয়ে আলোচনা একদিকে জাতিগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালি পরিচয়ের বিপরীতে ধর্মের প্রশ্নকে হাজির করা হয়েছে।

একার্থে এই আলোচনা একেবারে নতুন নয়। বাংলাদেশ বলে এখন যে অঞ্চল পরিচিত সেই ভৌগলিক সীমার মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা বিতর্ক দীর্ঘ দিনের। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ধরনের সংঘ গঠনের সময় থেকেই এই আলোচনার শুরু। উদাহরণস্বরূপ, সৈয়দ আমির আলী কর্তৃক ১৮৭৭ সালে কেন্দ্রীয় জাতীয় মোহামেডান সোসাইটি প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৯৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়ক মুসলমান সভা (যা ১৯১১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে যুক্ত হয়) উল্লেখ করা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই ধরনের সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ভাষার বিষয়টি এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এবং বাংলাভাষী মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের দ্বিধার সূত্রপাত করে। কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে মুসলিম পরিচয়ের চিহ্ন হিসেবে উর্দু বা আরবি ভাষাকে সকলের যোগাযোগের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন, অন্যরা বলেন যে বাংলা বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাষা। এই বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করে দেয় তাঁরা কোন ভাষার পক্ষে অবস্থান নেবেন। ১৯২০-এর দশকে ভাষা প্রশ্নে জোরদার আলোচনা হয় তৎকালীন সাময়িকপত্রগুলোতে। ভাষা প্রশ্নের এই আলোচনায় আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটি এসেছে বাঙালি মুসলমান কী ভাষার চর্চা করবেন এবং কোন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেকে চিহ্নিত করবেন। যে সব সংগঠন বাংলাভাষার পক্ষে ছিল, তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজ। এই সংগঠন এবং তার মুখপত্র 'শিখা' বাঙালি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে যে একটি যুক্তিবাদী মুসলিম পরিচয়ের সুযোগ আছে তার পক্ষেই যুক্তি দেখিয়েছিল। সংগঠনের সাথে যুক্ত চিন্তাবিদদের কাজগুলি দেখিয়েছে যে মুসলিম এবং বাঙালি পরিচয় পরস্পর থেকে আলাদা কিছু নয়। তবে এর মধ্য দিয়ে এই আলোচনায় কোনো রকমের সমাপ্তি ঘটেনি। ১৯৪০-এর দশকে বৃটিশ শাসনের অবসান ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মুখে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে কি না সেই আলোচনার ভেতরে এই আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটি উপস্থিত থাকে। ১৯৪৩ সালেই তার সূচনা

হয়। এই বিতর্কের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভাষা আন্দোলন বিষয়ক গবেষণায় এটা স্পষ্ট যে, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক এই আন্দোলন কোন অবস্থাতেই ধর্মভিত্তিক পরিচয়ের অস্বীকৃতি নয়।

কিন্তু বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার উত্থান ও পতনের একটি প্রভাবশালী আখ্যানের যুক্তি হচ্ছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত চেতনা' এবং এই চেতনাই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাঁরা আত্মপরিচয়ের এই বিতর্ককে এমনভাবে সাজান যেন মনে করা হয় যে, বাঙালি এথনিক জাতীয়তাবাদ সহজাতভাবে ধর্মীয় পরিচয়ে নিজেকে চিহ্নিত করার বিরোধী। তাঁরা জাতিগত পরিচয় বনাম ধর্মকে বাইনারিতে পরিণত করেন। বিতর্ককে এইভাবে সাজানোর কারণে জাতীয় পরিচয় গঠন এবং পরিচয়ের রাজনীতির যে জটিলতা আছে তা হারিয়ে যায়। এই যুক্তির একটি ধারার প্রবক্তারা বলেন যে বাংলায় ইসলামের যে সমন্বয়বাদী ধারার ঐতিহ্য আছে, ইসলামের যে স্থানীয় রূপ আছে জাতিগত পরিচয়ের মধ্যে এগুলো অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। ফলে ধর্মীয় পরিচয়ের কথা আলাদা করে বিবেচনার দরকার নেই। এই ধরণের যুক্তি যারা দেন তাঁরা বলেন যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফাউন্ডেশনাল প্রিন্সিপাল বা প্রতিষ্ঠাতা নীতি হিসেবে যে মুসলিম পরিচয় কাজ করেছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সেই মুসলিম পরিচয়ের প্রত্যাখ্যান। এই ধারার অনুসারীরা বলেন যে, ধর্ম, আত্মপরিচয় এবং রাজনীতির আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে ১৯৭২ সালে সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতাকে' একটি রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। এই বিধান জনপরিসর থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করার পক্ষেই নিষ্পত্তি করেছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই আলোচনায় কখনোই এটা স্মরণ করা হয়না যে ১৯৭২ সালে বা তার পরে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে সুস্পষ্ট করা হয়নি, তার সঙ্গে জাতীয় বা আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন আলোচিত হয়নি। তদুপরি রাষ্ট্রীয় এই নীতি বিষয়ে জনগণের সম্মতি চাওয়া হয়নি।

এই ধারার অনুসারীরা এর পরে আইন এবং সাংবিধানিক ইতিহাসকেই প্রাধান্য দেন। তাঁরা জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার অবসান এবং জেনারেল এইচ এম এরশাদের আমলে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের অন্তর্ভুক্তির উল্লেখ করে বলেন যে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ধর্মের প্রতি পক্ষপাত হচ্ছে বাংলাদেশে নাগরিকদের মুসলিম পরিচয়ের বিকাশের কারণ। ওপর থেকে ইসলামীকরণের এই প্রক্রিয়াকেই তাঁরা আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে একমাত্র উপাদান বলে বিবেচনা করেন।

এই ধারা বিপরীতে যারা যুক্তি দেন তাঁরা বলেন যে, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তর্ভুক্তির নেতিবাচক বা বিপরীত প্রতিক্রিয়া হচ্ছে জনপরসিরে এবং আত্মপরিচয়ের প্রশ্নের ইসলামের পুনরুত্থান। তাঁরা ইসলামপন্থী দল বা সংগঠনের উপস্থিতি এবং ভূমিকার

চেয়ে একে দেখান নাগরিকদের লোকাচারের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের অসঙ্গতি হিসেবে। তাঁর এও বলেন যে, এটি হচ্ছে এই জনপদের ঐতিহাসিক পথে প্রত্যাবর্তন। এদের এই বক্তব্যের ভেতরেও রাষ্ট্রের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেবার প্রবণতা।

প্রকৃতপক্ষে, উভয় ব্যাখ্যার মধ্যেই বেছে বেছে এই অঞ্চলের ইতিহাস ব্যবহার করার প্রবণতা সুস্পষ্ট। একদিকে কথিত সেক্যুলারপন্থীরা ইতিহাসের সেই অংশের কথা বিস্মৃত হন যেখানে ধর্মীয় পরিচয়কে অস্বীকার না করেও কিংবা ধর্মভিত্তিক মুসলিম আত্মপরিচয়ের পাশাপাশি জাতিগত পরিচয়কে মানুষ ধারণ করেছে এবং দীর্ঘ দিন ধরেই এই আলোচনা উপস্থিত ছিল। অন্যদিকে যারা মুসলিম পরিচয়কে প্রধান্য দেন তাঁরা এটা বলেন না যে বাংলায় ইসলামের বিভিন্ন ধারা উপস্থিত আছে এবং মুসলিম পরিচয় একটি মনোলিথিক বা একক পরিচয় নয়। গত কয়েক দশকে এইভাবে দুটি খণ্ডিত ব্যাখ্যা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এটাও বলা দরকার যে, আত্মপরিচয়ের এই আলোচনা এলিট শ্রেণির আলোচনা বলেই বিবেচনা করা দরকার। আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে এমন কোন বিরোধ সৃষ্টি করেনা যা তাঁদেরকে পরস্পরের মুখোমুখি করে দেয়। হাজার বছর ধরে বহুমাত্রিক পরিচয়ে বাংলাদেশের বাঙালি নিজেকে পরিচিত করেছে। বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্যে তা কোনভাবেই ভিন্ন নয়।

কিন্তু রাজনৈতিক বিবেচনা, ইতিহাসের অংশ বিশেষের সীমিত ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে এই বিরোধকে প্রসারিত করা হয়েছে। রাষ্ট্র এবং রাজনীতিবিদরা এই বিভাজনকে এমন জায়গায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছেন যে, এক দীর্ঘ সময় ধরে রাজনীতির কেন্দ্রে এই প্রশ্নই আবর্তিত হয়ে আসছে। এই বিতর্ককে আশ্রয় করে ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী হবে সেই বিষয়ে আলোচনা হবার কথা ছিল নাগরিকের অধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে।

রাষ্ট্রীয় নীতিমালার পরিবর্তন, বিশেষ করে রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক দলের বিকাশের পটভূমিতে এই বিতর্কের বিস্তার লাভ করলেও এর দায়িত্ব যারা নাগরিকের ধর্মীয় পরিচয়কে তাঁদের আত্মপরিচয়ের অংশ বলে বিবেচনা করতে চাননি তাঁদের ওপরেও বর্তায়। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক ক্ষতিকারক বিভাজনের পথ উন্মুক্ত হয়েছে এবং তাতে করে তারাই লাভবান হয়েছেন যারা নাগরিকের বহু পরিচয়ের ধারণাকে খারিজ করে দেন। বহুমাত্রিক আত্মপরিচয়ের প্রশ্নকে এড়িয়ে যারা ধর্মের প্রশ্নকে স্বল্প মেয়াদের স্বার্থে ব্যবহার করছেন তাঁরা নিজেরাও জানেন যে এর পরিণতি ইতিবাচক হয়না। অন্য দিকে যারা ধর্মকে খারিজ করে দেন তাঁরা আসলে নাগরিকের পরিচয়ের প্রশ্নকে কেবল তাঁদের ক্ষুদ্র স্বার্থ দিয়েই বিবেচনা করছেন।

শেষ কথা

যে কোনো দেশের রাজনীতির ইতিহাসকে দেখার এবং বিশ্লেষণের একটি মাত্র পথ নেই, ইতিহাসের একটি মাত্র বয়ান বা ন্যারেটিভ থাকতে পারেনা। একটি ন্যারেটিভের কথা – তা সঠিক ইতিহাসের অজুহাতেই হোক কিংবা অন্য যে কারণেই - বলা হোক না কেন তা ইতিহাসের গভীরতা এবং ব্যাপ্তিকে ধারণ করেনা। বাংলাদেশের রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে এসে এই উপলব্ধি জরুরি যে, রাজনীতিকে কেবল ঘটনাধারা দিয়ে বুঝলে তা হবে অসম্পূর্ণ। বাংলাদেশের রাজনীতির মূল প্রবণতাগুলোকে শনাক্ত করা এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে এখন জরুরি কাজ।

গণতন্ত্র, শাসনব্যবস্থা, সামাজিক বৈষম্য, জবাবদিহি, দুর্নীতি, রাজনীতি ও ধর্মের সম্পর্ক বিষয়ে বিভিন্ন চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শিক অবস্থান বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ছিল। গত ৫০ বছরে অন্যান্য ইস্যুকে কেন্দ্র করে এগুলোর কোনো কোনোটি কখনো কখনো সামনে এসেছে, কিন্তু এর অনেকগুলো একার্থে অমীমাংসিত বিষয় হিসেবেই থেকে গেছে। যেকোনো সময়ে জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় কিছু বিষয় অমীমাংসিত থাকা কোনো ব্যতিক্রম নয়। কোনো জাতি ও জাতিরাষ্ট্র যত পরিপক্ব হয়ে ওঠে, সেই রাষ্ট্র ও তার নাগরিকেরা একাদিক্রমে অমীমাংসিত বিষয়গুলোর মোকাবিলা করে; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিষয় প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে, কিছু বিষয় আরও বেশি জরুরি হয়ে ওঠে।

গত কয়েক বছরে আমরা একই সময়ে গণতন্ত্র, শাসনব্যবস্থা, সামাজিক বৈষম্য, জবাবদিহি, দুর্নীতি, রাজনীতি ও ধর্মের সম্পর্ক বিষয়গুলো রাজনীতির কেন্দ্রে এসে হাজির হতে দেখেছি। অবশ্যই বিষয়গুলো পরস্পরবিরোধী নয়, গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাবান মানুষ সুশাসন ও সামাজিক বৈষম্যের অবসানের দাবি করতেই পারে। রাজনীতি ও ধর্মের সম্পর্কের প্রশ্নে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন দুজন নাগরিকের ভিন্নমত থাকা অসম্ভব নয়। একইভাবে কোনো এক বিষয়ে কোনো নাগরিকের অবস্থান অন্য বিষয়ে তার কী অবস্থান হবে, তা নির্ধারণ করে না। ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের জবাবদিহির দাবি তোলার মানে এটা নয় যে তাঁদের দেশপ্রেম নিয়ে সংশয় আছে, কিংবা ওই নাগরিক অন্য প্রশ্নে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার সমর্থক হতে পারবে না। বিরোধী দলের দায়িত্বজ্ঞানহীন, আশু স্বার্থপ্রণোদিত আচরণের বিরোধিতা করা মাত্রই তাকে ক্ষমতাসীনদের অনুচর বলার সংস্কৃতি অগ্রহণযোগ্য। দুজন নাগরিকের ভেতরে একটি বিষয়ে মতৈক্য মানে সব বিষয়ে তাদের মতৈক্য হবেই—এমন আশা করা অসমীচীন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে 'শত্রু' বলে গণ্য করা, তার ন্যূনতম নাগরিক অধিকার হরণ করা এবং সহিংসভাবে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক শক্তিরা নিজেদের জন্যই কেবল বিপদ ডেকে আনে তা নয়, তারা গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয়কেই অস্বীকার করে, সমাজে অসহিষ্ণু সংস্কৃতি তৈরি করে, যার পরিণাম তাদেরও ভোগ করতে হয় আজ অথবা আগামীকাল।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অগ্রাধিকার তৈরিতে নিঃসন্দেহে ভিন্নমত থাকবে। কিন্তু গত বছরগুলোতে দেশের রাজনীতি ও সমাজে অগ্রাধিকারের প্রশ্নে অন্যের ওপরে নিজের পছন্দ চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এটি গণতান্ত্রিক সমাজের লক্ষণ নয়। এই অবস্থা কেবল তাঁরাই পছন্দ করেন, যাঁরা গণতন্ত্রকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে একধরনের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকূল সামাজিক ও মানসিক পরিস্থিতি তৈরি করতে চান। বল প্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন ও সন্ত্রাসী আচরণের মাধ্যমে, দাবি আদায়ের নামে, সাংবিধানিক ধারা চালু রাখার অজুহাতে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার বাতাবরণ তৈরি করে, ধর্মকে আশ্রয় করে কিংবা অন্য যেকোনো আদর্শের নামেই তা করা হোক না কেন, তা বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে এক অন্ধকার পথে চালিত করবে। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যতই অপসৃত হয়েছে, এই প্রবণতা তত বেশি শক্তিশালী হয়েছে। একাধিক একতরফা নির্বাচন গণতন্ত্রের উল্টো পথেই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়েছে। বাংলাদেশ কোন পথে এগোবে, তা নিয়তি-নির্ধারিত নয়, রাজনীতিতে কোনো পথই অনিবার্য নয়। রাজনৈতিক নেতারা ও নাগরিকেরাই এই পথ নির্ধারণ করবেন। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের দায়িত্ব অন্যদের চেয়ে বেশি।

ক্ষমতাসীন দল যদি দেশে নিয়মতান্ত্রিক সাংবিধানিক রাজনীতির ধারাকে মুখ্য ধারা বলে মনে করে, তবে কেবল কথায় নয়, কাজেও তা প্রমাণ করতে হবে। সহিংসতা মোকাবিলা করে নাগরিকের নিরাপত্তা দেওয়া যেমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তেমনি নাগরিকের ভিন্নমত প্রকাশ এবং তার পক্ষে সংবিধান প্রদত্ত গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। ক্ষমতাসীনদের জন্যে তা অবশ্য-করণীয়। এর অন্যথা হলে অসাংবিধানিক শক্তি এবং সব ধরনের উগ্রপন্থাই লাভবান হবে। ক্ষমতাসীনরা এই থেকে সাময়িকভাবে লাভবান হতে পারেন, কিন্তু দেশের ভবিষ্যতের জন্যে তা ভয়াবহ অবস্থার ইঙ্গিত দেয়।

গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের নাগরিকরা সব ধরনের প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে অগ্রসর হয়েছেন, দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। জনগণের এই অপরিমেয় শক্তির ওপরে আস্থা রাখা এবং তাদের জন্যে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করাই হচ্ছে আশু কাজ। এই কাজে সাফল্যের ওপরে নির্ভর করছে বাংলাদেশের রাজনীতি ভবিষ্যতে কোন পথে অগ্রসর হবে।

***

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড

বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন নিজের নামানুসারে ২০১৫ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই ট্রাস্ট ফান্ডটি প্রতিষ্ঠা করেন। অত্র ট্রাস্ট ফান্ডটির উদ্দেশ্য হলো– *ইতিহাস*, *মুসলমানদের ইতিহাস*, *সংস্কৃতি*, *ঐতিহ্য*, *মানবিক মূল্যবোধ*, *মানবাধিকার সুরক্ষা*, *বাংলাদেশের রাজনীতি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে* গবেষণাকে উৎসাহিত করা এবং বার্ষিক বক্তৃতার আয়োজন করা।

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ১৯৩৭ সালের ২৯ জানুয়ারি গোপালগঞ্জ জেলার পাইককান্দী ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করার পর তিনি তৎকালীন ডব্লিউ.পি.এইচ.এস. (বর্তমানে পাকিস্তান হেলথ সার্ভিস)-এ যোগদান করেন। অতঃপর তিনি উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য দেশ ত্যাগ করেন। কয়েক বছর বিদেশে অতিবাহিত করার পর ডা. হোসেন বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং এখানে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা শুরু করেন।

পরবর্তীকালে ১৯৯০-এর দশকে তিনি বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৯ সালে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

অধ্যাপক হোসেন চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ের পাশাপাশি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি নিয়েও লেখালিখি করেছেন। অধ্যাপক হিসেবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকাশনা ছাড়াও তিনি স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ষাটেরও অধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। তার প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে রয়েছে *ডাক্তার ও রোগী* (১৯৮৯); *ইন্টারন্যাশনাল প্রেস অন বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার* (১৯৮৯), *বিয়েভিয়ারাল সায়েন্স* (১৯৯৭) ইত্যাদি।

ডা. দেলোয়ার হোসেন বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের ফেলো এবং জীবন সদস্য। তাঁর জীবনী ১৯৯৬ সালে এবিআই ডাব্লিউএইচও এর ডিরেক্টরিতে প্রকাশিত হয়। তিনি আমেরিকান বায়োগ্রাফিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং এর আন্তর্জাতিক গবেষণা বোর্ড কর্তৃক

"ম্যান অফ দ্য ইয়ার ১৯৯৭" নির্বাচিত হন। আইবিসি, কেমব্রিজ, ইংল্যান্ড অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনকে "আইবিসি শীর্ষ ১০০ স্বাস্থ্য পেশাদার ২০১১"-এর একজন হিসেবে নির্বাচিত করে।

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক, সমাজসেবী, লেখক, সংগঠক এবং শিক্ষাবিদ হিসেবে সমাদৃত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিসহ বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলাদেশে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, ক্লিনিক এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন।

ট্রাস্ট ফান্ডের কার্যক্রম:

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ট্রাস্ট ফান্ডের উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম, *Cultural borrowing in the era of globalization: The relevance for Bangladesh*। বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি ২০১৬ সালের ২৪ মে অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম, *রেনেসাঁসের সন্ধানে*। বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি ২০১৭ সালের ৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. হাসিন অনুপমা আজহারী, সভাপতি, মেডিকেল ফিজিক্স এন্ড বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম, *Medical Physics and Cancer Care Aspects in Bangladesh*। বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি ২০২০ সালের ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

আজ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ট্রাস্ট ফান্ডের চতুর্থ বক্তৃতা প্রদান করবেন, ড. আলী রীয়াজ, ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র। তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম, *বাংলাদেশের রাজনীতির পঞ্চাশ বছর: প্রত্যাশা, প্রকৃতি ও প্রবণতা।*

ড. আলী রীয়াজ

ড. আলী রীয়াজ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো এবং আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট। ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটিতে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ড. রীয়াজ ২০১৩ সালে উড্রো উইলসন সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল স্কলারস-এ পাবলিক পলিসি স্কলার হিসেবে কাজ করেছেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন। তিনি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগাযোগ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। ড. রীয়াজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক এবং সহকারী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন। এ ছাড়া শিক্ষকতা করেছেন ইংল্যান্ডের লিংকন বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলাইনার ক্ল্যাফলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি লন্ডনে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন (১৯৯৫-২০০০)। তাঁর গবেষণার বিষয়গুলোর মধ্যে আছে গণতন্ত্রায়ন, মাদ্রাসা শিক্ষা, সহিংস উগ্রবাদ, দক্ষিণ এশিয়ার ও বাংলাদেশের রাজনীতি।

ড. রীয়াজের সাম্প্রতিক প্রকাশনাসমূহের মধ্যে আছে *ভোটিং ইন এ হাইব্রিড রেজিম: আন্ডারস্ট্যান্ডিং ২০১৮ বাংলাদেশী ইলেকশন* (২০১৯); *বাংলাদেশ: এ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স* (২০১৬)। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ হচ্ছে *রিলিজিয়ন এ্যান্ড পলিটিক্স ইন সাউথ এশিয়া* (দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০২১); *পলিটিক্যাল ভায়লেন্স ইন সাউথ এশিয়া* (২০১৯); *রাটলেজ হ্যান্ডবুক অফ কনটেম্পোরারি বাংলাদেশ* (২০১৬)। বাংলায় প্রকাশিত তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে আছে *নিখোঁজ গণতন্ত্র* (২০২১)।